বাংলা উপন্যাসের ধারায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব ও অবদান

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে যে বন্দ্যোপাধ্যায়-ত্রয়ীর আবির্ভাব বাঙলা কথাসাহিত্য জগতে নতুন যুগের সম্ভাবনা সূচিত করেছিল, তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই (বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক)। উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনাকে স্বক্ষেত্র-রূপে নির্বাচন করলেও তাদের স্থানিক পটভূমি, সামাজিক ব্যক্তি-মানুষ এবং দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকেই স্বক্ষেত্রে ছিলেন স্বরাট। বিভূতিভূষণ ব্যক্তিজীবনে প্রধানতঃ শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও মাঝে মাঝে তাকে কর্মান্তর গ্রহণ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এবং এইভাবেই তাকে এক গোরক্ষিণী সভার প্রচারক, গৃহশিক্ষক, প্রাইভেট সেক্রেটারী, নায়েব, তহশিলদার প্রভৃতি বিচিত্র কর্মজীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে হয়েছিল। তবে এই বিচিত্র জীবনচর্যা তার বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা আহরণের সহায়ক হয়েছিল। কর্ম-উপলক্ষে নিয়ত বাসস্থান পরিবর্তনের কারণেও বিভূতিভূষণ যেমন বাঙলার পল্লীজীবন ও নাগরিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তেমনি ভাগলপুর, ঘাটশিলা, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে বাসকালে পাহাড় ও অরণ্যের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবারও সুযোগ পেয়েছিলেন। বস্তুতঃ এ সমস্তই তার মনোজীবন-গঠনে এবং সাহিত্য রচনায় বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১৯২৯ খ্রীঃ 'পথের পাঁচালী' রচনার মধ্য দিয়েই বিভূতিভূষণের সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে যাত্রা শুরু। অবশ্য তার অনেক পূর্বেই 'প্রবাসী' (১৩২৮ বঃ) সাময়িকপত্রে 'উপেক্ষিতা' নামক একটি ছোটগল্পেই তার হাতেখড়ি হয়েছিল। তবে পূর্ণ সিদ্ধি আয়ত্ত হয় 'পথের পাঁচালীতে'ই। এর পরে তিনি যথাক্রমে নিম্নোক্ত উপন্যাসগুলি রচনা করেন ও 'অপরাজিত' (১৯৩২), 'চাদের পাহাড়' (১৯৩৭), 'আরণ্যক', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪০), 'দেবযান' (১৯৪৪), 'কেদার রাজা' (১৯৪৬), 'ইছামতী' (১৯৫০), 'অশনি সংকেত' (১৯৫৯) প্রভৃতি। বিভূতিভূষণ ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়েই প্রথমে হাত পাকিয়েছিলেন এবং নিঃসন্দেহেই পরবর্তীকালে তাতে সিদ্ধিও অর্জন করেছেন। তিনি দুই শতাধিক ছোটগল্প রচনা করেন এবং তা উনিশটি গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। তার প্রধান গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ 'মেঘমল্লার' (১৯৩১), 'মৌরিফুল' (১৯৩২), 'যাত্রাবদল' (১৯৪৪), 'তালনবমী' (১৯৪৪), 'কুশলপাহাড়ী' (১৯৫০) প্রভৃতি। এগুলি ছাড়াও বিভূতিভূষণের রচিত বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে রয়েছে ঃ 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৩৪২), 'কিন্নরদল' (১৩৪৫), 'অনুবর্তন' (১৩৪৯), 'মুখোশ ও মুখশ্রী' (১৩৫৪), 'অভিযাত্রিক', 'বিপিনের সংসার', 'তৃণাঙ্কুর', 'উর্মিমুখর' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত ব্যতীতও বিভূতিভূষণ শিশুসাহিত্য, দিনলিপি প্রভৃতি রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বিভূতিভূষণ তার সমকালীন লেখকদের তুলনায় সাহিত্যজগতে একটু ভিন্ন পথের পথিক ছিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলিতে সমাজ-বাস্তবতা বা জীবন-সমস্যা তত প্রখরভাবে ফুটে ওঠেনি; পক্ষান্তরে তিনি অনেকটা কবি-দার্শনিক-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই জগৎ ও জীবনকে দেখতে চেষ্টা করেছেন। যে তিনটি প্রধান উপাদানকে অবলম্বন করে বিভূতিভূষণের সাহিত্যজগৎ সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আছে প্রকৃতি চেতনা, অধ্যাত্মচেতনা এবং বর্তমান বিশ্বচেতনার স্বরূপ-উপলব্ধি ও অতীতের স্মৃতিচারণ। এই ত্রয়ীর সংযোগে সৃষ্ট জীবন-দর্শনকেই তিনি তার বিভিন্ন উপন্যাসে ও ছোটগল্পে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তার প্রতিনিধি-স্থানীয় কয়েকটি উপন্যাসের বিশ্লেষণে তাঁর এই বিশেষ প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

বিভূতিভূষণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'পথের পাঁচালী' ও দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'অপরাজিত' উপন্যাসের মধ্যেই একদিকে যেমন ব্যক্তি বিভূতিভূষণের সন্ধান লাভ করা যায়, তেমনি পাওয়া যায় তার মানস-জীবনেরও পরিচয়। গ্রন্থদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে দু'জন কৃতবিদ্য মনীষীর বক্তব্যে এর মর্মকথাটি ধরা পড়বে। ডাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'পথের

পাঁচালী' ও 'অপরাজিতে'র মধ্যে লেখক উপন্যাসের বাঁধা পথ অবলম্বন করেন নি, একটি বালক-চিত্ত কীভাবে রূপকথার রূপলোকে বিচরণ করতে করতে অগ্রসর হল, জীবনের নানা ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও তার সে রূপজগৎ হারিয়ে গেল না, তারপর পুত্রের মধ্যেও সেই জীবন-প্রতীতি বয়ে চললসেই কথাটাই বিভূতিভূষণ অসাধারণ শিল্পরূপের দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন।" ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই তিনখণ্ডে বিভক্ত বৃহৎ উপন্যাস একটি কল্পনা-প্রবণ অধ্যাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির মহাকাব্য নামে অভিহিত হইতে পারে। ইহার মৌলিকতা ও সরস নবীনতা বঙ্গ সাহিত্যের গতানুগতিকতার মধ্যে পরম বিস্ময়াবহ আবির্ভাব। প্রকৃতি বর্ণনা, শৈশবচিত্র ও বাস্তবতার স্তর বহিয়া আধ্যাত্মিকতার উত্তঙ্গ শৃঙ্গারোহণএই ত্রিবিধ প্রভাবের অনবদ্য ভাবপরিণতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসকে বরণীয় করিয়াছে।" সম্মিলিতরূপে 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' যে অপূর্ব জীবনবোধের সৃষ্টি করেছে, বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এর সমান্তরাল কোন সৃষ্টি নেই—এটি একক ও অতুলনীয়।

বিভূতিভূষণের অপর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'আরণ্যক'। এটি এমন একটি উপন্যাস যেখানে প্রকৃতি স্বয়ং নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। অতএব বিষয়বস্তুর বিচারে এর স্বকীয়তা সন্দেহাতীত। "উপন্যাস মহাকালের মধ্য দিয়ে চলমান মানব সভ্যতা ও সমাজের নানা ভাঙাগড়া উত্থান- পতনের প্রতিচ্ছবি—যা প্রধানতঃ চরিত্র-নির্ভর। সমসময়, এবং বৃহত্তর দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবী ও পারিপার্শ্বিক লেখকের কাছে কি রূপে ধরা দিয়েছিল, লেখক সেটিকেই একটি মূল কাহিনী ও কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। 'আরণ্যকে' ঠাসবুনন কাহিনী অনুপস্থিত; যে কাহিনী রয়েছে তাতেও সুসংবদ্ধ ধারাবাহিকতা ও ক্রমে গল্প জমে উঠে শ্বাসরোধী উৎকণ্ঠার পর্যায়ে নিয়ে যাবার দিকটিকে বিভূতিভূষণ প্রাধান্য দেন নি। তাই এ উপন্যাস একান্তই লেখকের মনোজগতের ইতিহাস, ব্যক্তিগত দর্পণে প্রতিফলিত প্রিয়বস্তুর ছবি।" বিভূতিভূষণের এই 'আরণ্যক' উপন্যাসটিও বিশ্বসাহিত্যে একক। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এমন সাযুজ্য আর কোথাও দেখা যায়নি। 'আরণ্যকে' র বিষয়বস্তু, এর বর্ণনা-বৈশিষ্ট্য, এর ভাষা-বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি নীচু তলার মানুষদের জীবন প্রত্যেকটি বিষয়ই সমানভাবে আকর্ষণীয়।

পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে তো বটেই, বিভূতিভূষণের অপর সকল উপন্যাসের মধ্যেও প্রকৃতি-চেতনার সঙ্গে অধ্যাত্মচেতনার অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। তার এই আধ্যাত্মিকতা বোধের চরম বিকাশ ঘটেছে তার 'দেবযান' উপন্যাসে। তার শেষ জীবনের উপন্যাস 'ইছামতী'- যার জন্য তিনি মরণোত্তর 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেছেন, সেই গ্রন্থেও প্রকৃতিপ্রীতি ও আধ্যাত্মিকতাবোধের উৎকৃষ্ট পরিচয় লাভ করা যায়।

ঔপন্যাসিক রূপে বিভূতিভূষণের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তাঁর ছোটগল্পগুলিতেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকন্তু ছোটগল্পকার রূপে তিনি মানবহৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে লোকায়ত জীবনের যে পরিচয় দিয়েছেন, উপন্যাসে সেই দিকটা কতকাংশে উপেক্ষিত হয়েছে। এখানে তিনি প্রকৃতিকে ছেড়ে অনেকটা মানুষের কাছাকাছি এসেছেন এবং সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের আটপৌরে ঘরোয়া জীবনের বাস্তব চিত্রও অনেকটা তুলে ধরতে পেরেছেন। এ বিষয়ে বিভূতিভূষণের নিজস্ব বক্তব্যটি স্মরণীয়। তিনি বলেছেনঃ "যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে, তাদের কথা বলতেই হবে, তাদের সে গোপন সুখদুঃখকে রূপ দিতে হবে।" বস্তুতঃ ছোটগল্পে বিভূতিভূষণ তার অঙ্গীকারমতো সাধারণ মানুষের সুখদুঃখকেই রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' থেকে আরম্ভ করে পুইমাচা', 'সংসার', 'ডাকগাড়ী', 'বিপদ' প্রভৃতি গল্পে বঞ্চিতা নারীজীবনের সেই আলেখ্যই অঙ্কিত হয়েছে। জীবনে দুঃখই শুধু সত্য নয়, জীবনের আনন্দঘন দিকটিকেও তিনি উপেক্ষা করেন নি বলেই প্রেমানুভূতির আনন্দময় রোম্যান্টিক চিত্রও তার কোন কোন গল্পে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গক্রমে 'সুলোচনার কাহিনী', 'বিড়ম্বনা', 'বোতাম', 'চিঠি', 'অসাধারণ' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা

চলে। বিভূতিভূষণের অনেক গল্পে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে-এ জাতীয় অনেক গল্প কিশোরদেরও উপযোগী। 'অভিশপ্ত', 'বউচণ্ডীর মাঠ', 'প্রত্নত্ব', 'খুঁটি দেবতা' প্রভৃতি গল্পে এই অপার্থিব রসের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির শিল্পী বিভূতিভূষণের গল্পে প্রকৃতি একেবারে নির্বাসিত হতে পারে না, তারই সন্ধান পাওয়া যায় 'নদীর ধারে বাড়ি', 'প্রত্যাবর্তন', 'শাবলতলার মাঠ', 'কনে দেখা' প্রভৃতি গল্পে। এ ছাড়াও তাঁর প্রায় দু শত গল্পে বিচিত্র বিষয় ও রসের পরিচয় পাওয়া যায়- যা সর্বতোভাবেই উপভোগ্য।